'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা, মার্চ, ২০২১

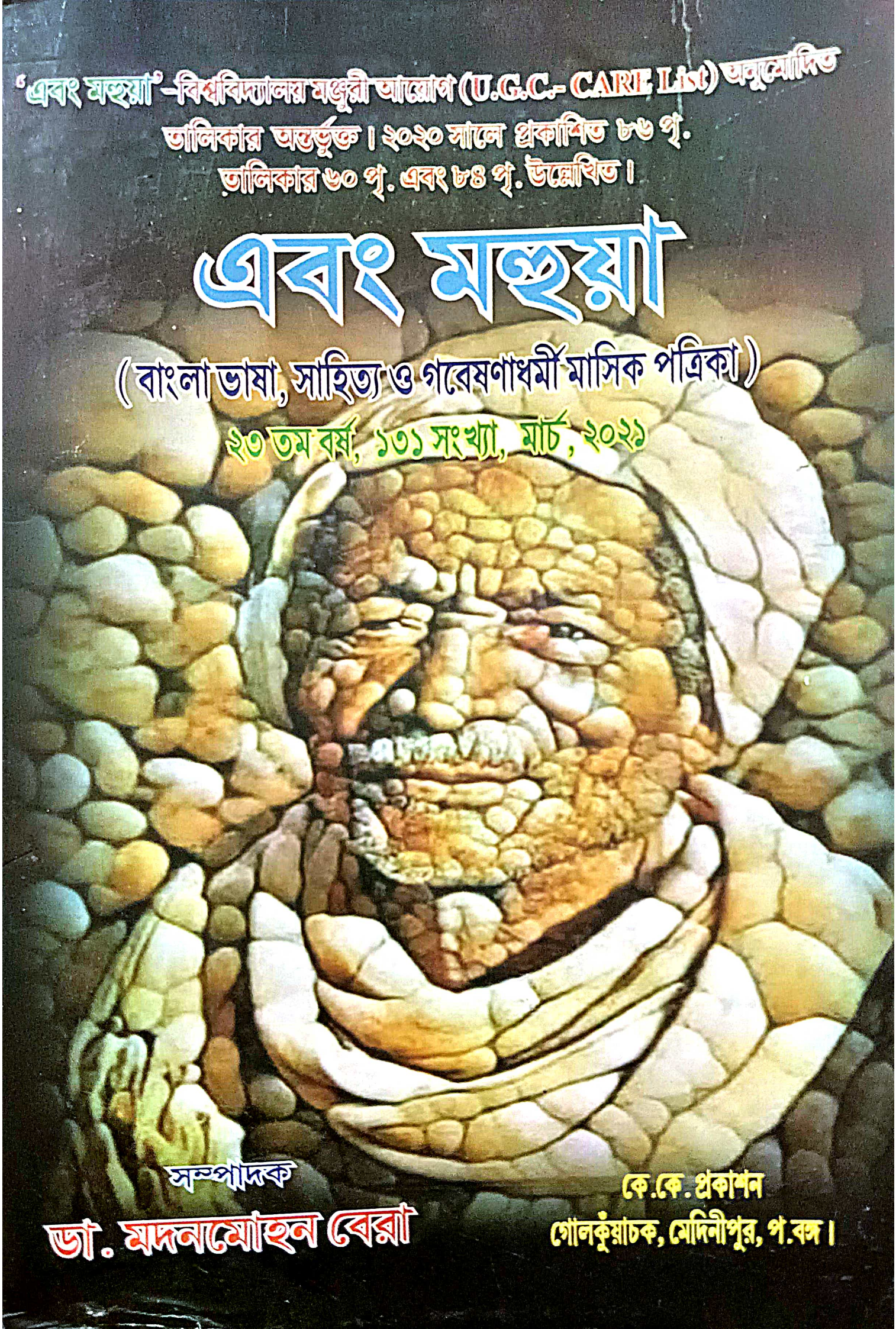

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন

ড. মৃণাল কান্তি সরেন

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন দ্বারাই প্রভাবিত। তিনি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা (Mean) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশকে বুঝিয়েছেন। ("All round drawing out of the best in child and man-- body, mind and spirit.") তিনি বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য বস্তুতান্ত্রিক নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তার বিকাশ সাধন করা। গান্ধীজি বলেছেন— "The Education should result not in material power but in spiritual force"। এই লক্ষ্যকে তিনি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি নাগরিকতার শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি মনে করতেন শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখানো যাবে। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এছাড়া, এই ধরনের শিক্ষা তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা এনে দেবে, তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করবে। আত্মসংযমের মাধ্যমে চরিত্রকে দৃঢ়তর করতে না পারলে শিক্ষার কোনো মূল্য থাকবে না। তিনি বলেছেন— "All our learning or recitation of the vedas, correct knowledge of Sanskrit, Latin or Greek and what not, avail us nothing if they do not avail us to cultivate absolute purity of heart. The end of knowledge must be the building of character."[১] তিনি শিক্ষাকে সামাজিক উন্নতির পন্থা হিসাবেও গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষা বলতে গান্ধীজি মানুষের অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার সত্তার বিকাশকে বুঝিয়েছেন। শুধু পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধিই নয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশেই হবে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। তাঁর মতে শিক্ষা বলতে শুধু আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনকে বোঝায় না। ব্যক্তিত্বের শিক্ষাই (Literacy of the personality) প্রকৃত শিক্ষা বলে তিনি মনে করতেন।[২]

গান্ধীজি পঠন, লিখন ও গণিত (Reading, Writing & Arithmetics) শিক্ষার চেয়ে তিনি হস্ত, মস্তক ও হৃদয়ের (Head, Hand and Heart, 3H) শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ ও আত্মোপলব্ধির উপায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না।[৩]

গান্ধীজির মতে মানুষের ভিতর যে বস্তু আছে তাহা বাহির করে আনাই প্রকৃত শিক্ষা। স্বাক্ষরতা কিংবা বিদ্যা মানুষ তৈরি করে না, যথার্থ জীবনের শিক্ষাই মানুষ তৈরি করে। আমি যে শিক্ষার কথা বললাম শিশুরা উহা শুধু গৃহে এবং মায়ের কাছে পেতে পারে।"

শিক্ষক হিসেবে গান্ধীজি কয়েকটি আদর্শ মেনে চলতেন। তিনি কখনো কোনো ছাত্রকে দৈহিক শাস্তি দিতে চাইতেন না। তিনি মনে করতেন দৈহিক শাস্তি দিলে পড়াশুনা সম্পর্কে এক গভীর ভীতির জন্ম হয়। পড়াশুনাকে ভালোবাসতে হবে। তবেই আমরা আমাদের এই বৌদ্ধিক জগতের অন্তঃপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করতে পারব। দুঃখের বিষয় ভুল পাঠক্রম নির্বাচন এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী এই জাতীয় আদর্শ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়। তার ফলে স্ফুটোন্মুখ একটি কুঁড়ি অকালেই ঝরে পড়ে। থেকে যায় শুধু ব্যথার্থ স্মৃতির বেদনা।"

গান্ধীজি ছিলেন সত্যের পুজারী। তিনি বলেছিলেন— I have no God to serve but truth. তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর সত্য, তিনি প্রেমময়। তাই তিনি বলেছেন— God is life, truth and light. গান্ধীজির মতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে সত্য প্রেম ও অহিংসার প্রয়োজন। অহিংসা এবং সত্য তাঁর কাছে একই বস্তু। তিনি চেয়েছিলেন সর্বোদয় সমাজ। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিকাশের সুযোগ পাবে। তিনি এক সময় বলেছিলেন— রুটির মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক সমাচার পরিবেশন করা যায়। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন।[৬]

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছেন— শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে গড়ে তোলা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী রূপে গড়ে তোলা এবং চরিত্র গঠন করা। গান্ধীজি শিক্ষার কৃষ্টিগত লক্ষ্যের উপর জোর দেন এবং তাঁর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ঈশ্বর লাভ করার একমাত্র পথ। তাঁর মতে— "Self realization is the sumum bonum of life and education"[৭]। তাঁর মতে সংযম হল আত্মোপলব্ধি তথা সত্য উপলব্ধির পথ। গান্ধিজীর মতে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গড়ে তোলা।

হিন্দু স্বরাজের রূপরেখা তৈরির প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন গত পঞ্চাশ বৎসর অথবা তাহা অপেক্ষাও বেশি সময়ে ভারতবর্ষ যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা পুরোপুরি ভুলে গেলে ভারতের মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। রেলপথ, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকল কিছু ত্যাগ করতে হবে।[৮]

গান্ধীজি গতানুগতিক ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন— শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া দরকার।

তাকে কতকগুলি অর্থহীন বিষয় শেখানো চলবে না। তাতে করে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকবে না। তাই পাঠক্রম নির্বাচনের সময় এমন সব বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে যার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সমাজ জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শিশুর সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও উপস্থাপিত হবে। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মাতৃভাষাকে পাঠ্য বিষয় এবং পাঠদানের মাধ্যম— দুই হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তশিল্পের উপরও গুরুত্ব তাঁর সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বলেছেন— "It will provide a healthy and moral basis of relationship, between the city and the village and thus go a long way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the classes."[১] গান্ধীজির শিক্ষা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদি শিক্ষার এক পাঠক্রম রচনা করেছেন। এই পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি হল— মূল হস্তশিল্প, মাতৃভাষা, গণিত, সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, ছবি আঁকা, সংগীত ও বাধ্যতামূলক শরীরচর্চা ব্যবস্থা। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন এই ধরনের পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির গভীর সংযোগস্থাপন সম্ভব হবে।

গান্ধীজি প্রচলিত পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে না। ব্যক্তির দেহ, মন এবং আত্মার সুষ্ঠ বিকাশের জন্য তিনি একটি হস্তশিল্পের (craft) কথা বলেছেন। একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান উপস্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ আধুনিক অনুবন্ধ প্রণালীতে (Principal of correlation) শিক্ষা দিতে হবে এই ছিল তাঁর অভিমত।

স্থানীয় চাহিদা অনুসারে শিল্পটি নির্বাচিত হবে। শিল্পটি শুধু উৎপাদনের মাধ্যম হবে তাই নয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর চরিত্র গঠন হবে এবং তার অবসর বিনোদনের সুযোগ ঘটবে। শিল্প শিক্ষার ভিতর দিয়ে শিশুদের মধ্যে আত্মসংযম, স্বাবলম্বন, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণের সৃষ্টি হবে।[২]

গান্ধীজির শিক্ষা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হল— "এই শিক্ষা জীবনের মাধ্যমে জীবনের শিক্ষা" (Education for life, through life)। আর এই শিক্ষা হবে হাতে-কলমে। সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। গান্ধীজির প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি সমাজ বিজ্ঞান (Sociological) মনোবৈজ্ঞানিক (Phychological) এবং শরীরবিজ্ঞানের (Physiological) তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩]

গান্ধীজি আত্মসংযম (Self-control) এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুরা তাদের নিজস্ব আবেগে চালিত হোক এ কথা তিনি বলেন নি। তাঁর মতে আবেগ, কল্পনা, ঈশ্বরকে যদি যথাযথ ভাবে সংযত করা না যায় তবে কোনোকিছু গঠনমূলক

কাজ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য তিনি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলার সমর্থক ছিলেন না। আত্মসংযম বলতে স্বতঃস্ফূর্ত হয় তার জন্য তিনি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন।[১২]

নিঃসন্দেহে গান্ধীজির শিক্ষা ভাবনা ছিল বৈপ্লবিক। জাতীয় রাজনীতির ন্যায় জাতীয় শিক্ষার এক সঙ্কটময় কালে তিনি তাঁর অভিনব শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে আবির্ভূত হন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় দাবী পূরণ করতে সক্ষম হন। তাঁর শিক্ষাভাবনা কেতাবী শিক্ষা থেকে অনেক বাস্তবধর্মী ছিল। এটি ছিল মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, শিল্পকেন্দ্রিকতা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, সম সুযোগের নীতি, গ্রাম উন্নয়ন, সমাজকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। শিক্ষাকে সমাজ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে, দেশ তথা সমাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং সেই অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর শিক্ষা ভাবনা একদিকে যেমন অস্পৃশ্যতা, মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি জাতীয় সমস্যা সমাধানের সহায়ক তেমনি শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, অহিংসা, সত্য, ন্যায়, ধর্মপরায়ণতা, আধ্যাত্মিকতা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, মানবিকতা, শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি মর্যাদাবোধ প্রভৃতি গুণাবলী ও সামর্থ্যের বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর গ্রামোন্নয়ণের ভাবনা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে।[১৩]

তথ্যসূত্র :

১. সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা- ৭০০০০৯, নতুন সংস্করণ- ১৫ই আগস্ট, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ৭০৯।

২. সরোজ চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৫, পৃ. ৩৩৩।

৩. তারিণী হালদার, অধ্যাপক (ড.) প্রবণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- জুলাই ২০১৪, পৃ. ১৬৫।

৪. মনীষী-ভাবনায় নতুন ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা- ৭০০০২৯, প্রথম প্রকাশ- মে ২০০৬, চতুর্থ মুদ্রণ- জুন ২০০৯, পৃ. ১২।

৫. পৃথ্বীরাজ সেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, এস. বি. এস. পাবলিকেশন,

কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- শুভ দীপাবলি, ১৪২৩, পৃ. ৪৮।
৬. সরোজ চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৫, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।
৭. তারিণী হালদার, অধ্যাপক (ড.) প্রবণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- জুলাই ২০১৪, পৃ. ১৬৬।
৮. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ- নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১৬।
৯. সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা- ৭০০০০৯, নতুন সংস্করণ- ১৫ই আগস্ট, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ৭০৯।
১০. সরোজ চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৫, পৃ. ৩৩৪।
১১. তারিণী হালদার, অধ্যাপক (ড.) প্রবণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- জুলাই ২০১৪, পৃ. ১৬৭।
১২. সরোজ চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৫, পৃ. ৩৩৪।
১৩. তারিণী হালদার, অধ্যাপক (ড.) প্রবণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- জুলাই ২০১৪, পৃ. ১৭১।